Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মো: শারাফাত করীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: মীমা খাতুন

রোলঃ ২১৫০০৪৯৩

৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মো: শারাফাত করীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: মীমা খাতুন

রোলঃ ২১৫০০৪৯৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: মীমা খাতুন, আইডিঃ ২১৫০০৪৯৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মো: শারাফাত করীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক না কুরআনের ভূমিকা বেশি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মো: শারাফাত করীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মীমা খাতুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

মোছা: মীমা খাতুন

আইডিঃ ২১৫০০৪৯৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
০১. সারসংক্ষেপ	৫
০২. সূচনা	৬
০৩. রাষ্ট্র বলতে কি বুঝি?রাষ্ট্র গঠনের উপাদানসমূহ	৮
০৪. সমাজ কি? সমাজ গঠনের উপাদানসমূহ	১০
০৫. বর্তমানে রাষ্ট্র সমাজের অভ্যন্তরীণ ভয়াবহ ক্ষতিকর দিকসমূহ	১২
০৬. প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা	২৫
০৭. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে রাষ্ট্র সমাজ গঠন	২৭
০৮. কুরআনের আলোকে রাষ্ট্র সমাজ গঠন	২৮
০৯. কুরআনের আলোকে রাষ্ট্র সমাজ গঠনে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষদের ভূমিকা	৪২
১০. কুরআনের আদলে জীবনাব্যবস্থা পরিচালনায় যথাযথ ব্যবস্থা সমূহ	৪৬
১১. সিদ্ধান্ত	৫০
১২. রেফারেন্স	৫১

০১. সারসংক্ষেপ

পবিত্র কোরআন এমন এক কিতাব, যা মানুষকে পবিত্র রাখে। এর মাঝে নেই কোন মিথ্যা, নেই কোন জড়তা, নেই কোন স্ব-বিরোধিতা। এতে রয়েছে সকল সমস্যার প্রতিকার। এজন্যই কোরআন মানব জীবনের মহা পথ প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত। যা বার বার পড়তে হয়, যা বারবার মানুষকে মহান আল্লাহর সকল মহিমা সম্পর্কে জানিয়ে যায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উত্তরণের জন্য কুরআনের ভূমিকা অপরিসীম। মানুষ হিসেবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। কিন্তু এই মোকাবিলা যদি হয় কুরআনের আলোকে তাহলে ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র বহুলাংশে উপকৃত হবে। পাঠ্যপুস্তকের আদলে রাষ্ট্র সমাজ গঠিত হলে বিভিন্ন ধরনের ভয়াবহ সমস্যার উদ্ভব হবে যা ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যাপক ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে।

শিক্ষা ছাড়া উন্নত নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন আদর্শ সুনাগরিক আশা করা যায় না। কোরআন জ্ঞান আহরণ ও শিক্ষা অর্জনের উপর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। একজন নবী এবং একটি জাতির কাছে আল্লাহর প্রেরিত কোরআনের প্রথম প্রত্যাদেশই ছিল ‘পড় তোমার প্রভুর নামে’। (সুরা আলাক, আয়াত : ১)

কোরআনের শিক্ষা ধারণ করে নবী মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ (সা.) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে একটি নিরেট নিরক্ষর জাতিকে সাক্ষরতাসম্পন্ন জাতিতে রূপান্তর করেন। কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি তাঁর অনুসারীদের জ্ঞান চর্চা, বিদ্যা অর্জন ও গবেষণায় এতটাই উৎসাহিত করেছেন যে, তার অনুসারীরা সুদীর্ঘ সহস্রাধিক বছরকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানে গোটা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। পৃথিবীর কোনও ধর্মগ্রন্থ বা মতবাদের বইয়ে এমন সার্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবৃত হয়নি। সুতরাং একমাত্র কুরআনের আদলে রাষ্ট্র গঠন করলে ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যথাযথভাবে উপকৃত হবে।

০২. সূচনা

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুন্দর এবং সব বিষয় সুন্দর হওয়াকে পছন্দ করেন। আল্লাহতায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের অধীনে থাকতে বলেছেন। কুরআনুল কারিমে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম'। ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তি প্রতিষ্ঠার ধর্ম। জুলুম, নির্যাতন, অন্যায় অত্যাচার, অরাজকতা, দুর্নীতি ইত্যাদি ইসলাম কখনই সমর্থন করে না। এই অশান্ত পৃথিবীকে শান্ত করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। একটা সমাজকে সুন্দর করতে ইসলাম ধর্মের কোনো বিকল্প নেই। আমরা সবাই একটা জিনিস জানি এবং বুঝি যে, মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষ একাকী থাকতে পারে না। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় মানুষকে। আদম (আ.)-কে প্রথম মানব হিসেবে সৃষ্টি করার পর হাওয়া (আ.)কেও সৃষ্টি করা হয়। যাতে আদম (আ.)কে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে না হয়।

সমাজ বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকা মানুষের একটি সহজাত চাহিদা। তাই চাইলেও কেউ একাকী থাকতে পারে না। পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা থাকলে মানুষের জীবন সত্যিকারভাবেই সুন্দর হয়। মানুষের মাঝে নানা গোষ্ঠী ও সমাজ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের অনেক জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান, আল্লাহতায়ালা সর্বজ্ঞাত ও সর্ববিষয়ে অবগত।' (সুরা হুজুরাত, আয়াত- ১৩) অন্যত্র ইরশাদ করেন, 'তার নিদর্শনের একটি হলো, তিনি তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের কাছে তোমরা প্রশান্তি অনুভব করো। তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া ঢেলে দিয়েছেন, এতে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা রুম, আয়াত- ২১)

সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটেই ইসলামের বিধি-বিধান আল্লাহতায়ালা অবতীর্ণ করেছেন। তাই কোরআন-হাদিসের দিকনির্দেশনা ও ইসলামের শিষ্টাচারগুলো সমাজের মানুষের মাঝে প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিধান সমাজ জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই ইসলামের সঙ্গে মানবসমাজের এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামপূর্ব সময়ে মক্কায় চরম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় বিরাজ করছিল। ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য-ভালোবাসা, পারস্পরিক সহযোগিতাসহ শিষ্টাচার হারিয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম এসে সমাজকে নতুনভাবে সাজাতে থাকে। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে মানুষ পরিণত হয় সোনার মানুষে। তাই সমাজচ্যুত কেউ ইসলামের মৌলিক আদর্শ লালন করতে পারে না। সবাইকে নিয়ে বসবাস করা এবং সংঘবদ্ধ হয়ে সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করাই ইসলামের মূল চাহিদা। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আর তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তর এক করেছেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১০১)

তথ্যসূত্র: https//sonalinews.com

০৩. রাষ্ট্র বলতে কি বুঝি? রাষ্ট্র গঠনের উপাদান সমূহ

রাষ্ট্র হল একটি ভৌগোলিক এলাকা ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে এমন এক রাজনৈতিক সংগঠন। রাষ্ট্র সাধারণত একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক সীমার ভেতর বসবাসকারী সমাজের সদস্যদের শাসনের জন্য নিয়ম-কানুন তৈরি করে।

এরিস্টটলের মতে, "রাষ্ট্র হল স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের জন্য কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সংগঠনে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র।"

ম্যাকিয়াভারের মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে সরকার প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন যার কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা রয়েছে এবং যা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসরত নাগরিকদের উপর বলবৎ হয়।"

গার্নারের মতে, "রাষ্ট্র হল বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন এক সমাজ যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত এবং যাদের সুসংগঠিত সরকার আছে যে সরকারের প্রতি ঐ জনসমাজ স্বভাবতই অনুগত।"

রাষ্ট্র মূলত প্রধান চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা:- জনসংখ্যা,ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

১. জনসংখ্যা: রাষ্ট্র হল মানুষের একটি মানবিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে জনসংখ্যা। জনসংখ্যা ছাড়া রাষ্ট্র হতে পারে না। একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। যেমন সুইজারল্যান্ড, কানাডা, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর এর মতো খুব ছোট জনসংখ্যার রাষ্ট্র। অন্যদিকে রয়েছে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়ার যেখানে খুব বেশি জনসংখ্যা রয়েছে।

রাষ্ট্রে বসবাসকারী লোকদের নাগরিক বলে। নাগরিকরা রাষ্ট্রের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার পাশাপাশি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। অন্য দেশের নাগরিকরা বসবাস করলে তখন তাদের বলা হয় বিদেশি। রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকল ব্যক্তি, নাগরিক

এবং সেইসাথে বিদেশিদের রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতি মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্র তার সরকারের মাধ্যমে তাদের উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে।

২. ভূখণ্ড: ভূখণ্ড একটি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় অপরিহার্য উপাদান। রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক ইউনিট। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হল এর অপরিহার্য উপাদান। একটি রাষ্ট্র কখনো আকাশে বা সমুদ্রে থাকতে পারে না। এর অংশ (অঞ্চল) নিয়ে গঠিত হয়। এটি মূলত একটি আঞ্চলিক রাষ্ট্র। একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আকার বড় বা ছোট হতে পারে।

রাশিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, ব্রাজিল ইত্যাদি বড় আকারের রাষ্ট্র। অন্যদিকে নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, সুইজারল্যান্ড, বুরুন্ডি ইত্যাদি ছোট অঞ্চল রাষ্ট্র। সমগ্র ভূখণ্ড রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধীনে বেষ্টিত। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি, সংস্থা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অঞ্চলের সার্বভৌম এখতিয়ারের অধীনে।

রাষ্ট্রের অঞ্চলের মধ্যে সমুদ্র বা কিছু দ্বীপও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আন্দামান ও নিকোবর ভারতের অংশ। সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের অংশ। রাষ্ট্র তার ভূখণ্ডের সমস্ত অংশের উপর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে।

৩. সরকার: সরকার হল রাষ্ট্রের অন্যতম সংস্থা বা ম্যাজিস্ট্রেসি যা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ, এবং বিচার করে। সরকার রাষ্ট্রের তৃতীয় অপরিহার্য উপাদান। রাষ্ট্র সরকারের মাধ্যমে তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

অনেকেই মনে করে যে রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। যাইহোক, এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত যে সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান মাত্র। এটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৪. সার্বভৌমত্ব: রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের চরম, চূড়ান্ত, অবাধ ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হলে কোনো দেশ রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হয় না। সার্বভৌমত্ব অন্যান্য সামাজিক সংঘ ও প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করেছে। সরকার চির পরিবর্তনশীল।

কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাই জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকলেই তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। বরং সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান থাকলেই রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার সংস্পর্শে একটি জনসংগঠন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলোতে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার রয়েছে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা নেই বলে সেগুলো রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয়। এ ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে।

তথ্যসূত্র: https://rocketsuggestionbd.com

তথ্যসূত্র: **https://www.lekhabl.com**

০৪. সমাজ কি? সমাজ গঠনের উপাদানসমূহ

সমাজ বলতে সাধারণত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায়। অর্থাৎ যখন কিছু মানুষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একত্রে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। এক্ষেত্রে সমাজের দুইটু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত কিছু মানুষের সংঘবদ্ধ বাস। দ্বিতীয়ত ঐ সংঘবদ্ধভাবে বসবাসের পেছনে কোন উদ্দেশ্য থাকা।

সমাজ গঠনের জন্যে কিছু উল্লেখযোগ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। নিচে সেগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরা হলো :

(১)পরিবার: পরিবার হলো সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ। মানুষের সঙ্গলাভ ও নিরাপত্তার উপর ভিত্তি করে পরিবারের জন্ম। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আদান-প্রদান ও সহযোগিতার জন্য পরনির্ভরশীলতা দেখা দেয়। এ পরনির্ভরশীলতা হতেই সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা।

(২) গোষ্ঠী: সমাজ গঠনে গোষ্ঠীর ভূমিকা যথেষ্ট। কেননা এক পরিবার বৃদ্ধি হয়ে বিভিন্ন পরিবারের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পরিবারকে একত্রে গোষ্ঠী বলে। রক্তের সম্পর্ক এবং

আত্মীয়তার বন্ধন হলো গোষ্ঠীর ভিত্তি। এভাবে বিভিন্ন পরিবার গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে একটি সমাজে পরিণত হয়।

(৩) উপজাতি: কালক্রমে গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়ে বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজন ভিন্ন ভিন্ন পেশা অবলম্বন করে। একই জাতীয় পেশা ও চালচলনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। এমনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে উপজাতি বলে। সমাজ গঠনে উপজাতির প্রভাবও যথেষ্ট।

(৪) ধর্ম: ধর্মও সমাজ গঠনের এক উল্লেখযোগ্য উপাদান। উপজাতি বৃদ্ধি পেয়ে অনেক উপজাতিতে রূপ নিলে পরিবার ও গোষ্ঠীর আত্মীয়তার বন্ধন এবং রক্তের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি নেমে আসে। তখন সামাজিক সেতু হিসেবে ধর্মের আবির্ভাব হলে উপজাতিসমূহ নতুনভাবে ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও সমাজ গঠন করে। এভাবেই ধর্ম সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

(৫) সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা: ধর্মকে কেন্দ্র করে সমাজ এবং সম্প্রদায় বিস্তৃতির সাথে সাথে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয়। ফলে ধর্মের বন্ধনও শিথিল হয়ে আসে। ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে পারে যে, সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। সুতরাং যুগে যুগে মানুষ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করে।

(৬) অর্থনৈতিক কাজকর্ম: মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সমাজ গঠনের বিশিষ্ট উপাদান। অতীতে এক সময় মানুষ পশুপালন ছেড়ে কৃষিকাজ শুরু করলে তাদের আয় উন্নতি বেড়ে যায়। ফলে মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং ধনসম্পদ রক্ষার জন্য সমাজ গড়ে তোলে। আজকের দিনেও অর্থনৈতিক স্বার্থই হলো রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠনের মূল প্রেরণা। অর্থনীতির জন্যই বর্তমান বিশ্বসমাজে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। সুতরাং মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি, ধর্ম, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা এবং অর্থনৈতিক কাজকর্ম সমাজ গঠনের উল্লেখযোগ্য উপাদান। এসব উপাদানগুলো সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র: **https// somajbiggan.com**

০৫. বর্তমানে রাষ্ট্র সমাজের অভ্যন্তরীণ ক্ষতিকর দিকসমূহ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ ছেয়ে গেছে। কতিপয় রাষ্ট্রনেতা নৈতিকতার বুলি আওড়ালেও তাদের নিজেদের নৈতিক পদস্খলন সুস্পষ্ট। যার ফলে সাধারণ মানুষজন ও তাদের নৈতিক গুণবলি থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। এমনকি ক্ষমতার মদদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কোনপ্রকার ভয় ভীতি ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের অন্যায় ও অপরাধ সংঘটন করছে। এসব অপরাধ সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, একসময় ক্যান্সারের ন্যায় মরণব্যাধিতে পরিনত হচ্ছে। এবং সময়ের সাথে সাথে এই ধরনের অপরাধ ও অসংলগ্ন কার্যকলাপ সবার কাছে স্বাভাবিক মনে হতে শুরু করেছে। সমাজের বিভিন্নধরনের অনৈতিক-অসংলগ্ন কার্যকলাপ ও অপরাধ নিচে তুলে ধরা হলো:

★ মিথ্যাচার-প্রতারণা :- মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী। একটি মিথ্যা থেকে বাঁচতে আরেকটি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।এর মাধ্যমে একেরপর এক পাপের উৎপত্তি হয়। মানুষ সাধারণত প্রথমত সাধারণ কোন বিষয়ে মিথ্যা বলে এরপর আস্তে আস্তে মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।ছোট-বড় যেকোন বিষয়ে অকপটে মিথ্যা বলে। বর্তমান সমাজে মিথ্যা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। মানুষ অবলীলায় মিথ্যা বলে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর মারাত্বক প্রভাব ফেলছে। আর তথ্য প্রযুক্তির যুগ হওয়ায় মিথ্যা বলা আরো সহজ হয়ে গিয়েছে। মানুষ ঘরে বসে পরিচিত অপরিচিত সবার সাথে কোন কারণে বা কারণ ছাড়াই খুব সহজেই মিথ্যা বলছে। যার ফলে সমাজের মানুষের

মাঝে নৈতিক অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে মিথ্যা থেকে প্রতারণা, মানুষকে ঠকানো, এ যেন নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপরদিকে প্রতারণা হচ্ছে অসদুপায় অবলম্বন করে মানুষকে ঠকানো বা ধোঁকা দেওয়া।সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতারণার জাল বিছিয়ে আছে।মানুষ সুযোগ পেলেই একে অপরের সাথে প্রতারণা করে,ধোঁকা দেয়। প্রতারণার মাধ্যমে সবার কম বেশি লক্ষ থাকে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া। ভোগবাদি সমাজ ব্যবস্থায়, একজন আরেকজন ধোঁকা দিয়ে কিছু মুনাফা অর্জন করতেই পারলেই মুখে ফুটে ওঠে বিজয়ের হাসি। এগিয়ে চলে পুনরায় প্রতারনার জাল বিছানো। এভাবেই সমাজ চলছে যা আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে অন্ধকারের দ্বারপ্রান্তে।

মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। আল কোরআন ও হাদিসে মিথ্যুক এবং মিথ্যাবাদীর ভয়ানক পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ কর না।’ (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩৬)।

রাসূল (সা.) বলেন, ‘মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন মিথ্যার দুর্গন্ধে ফেরেশতারা মিথ্যাবাদী থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।’ (তিরমিজি : ১৯৭২)।

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে হুশিয়ার করে বলেন, ‘সুতরাং পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক (দ্বিমুখিতা) রেখে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছে তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল তার কারণে। (সূরা তওবা, আয়াত : ৭৭)।

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সুপথ প্রদর্শন করেন না। ’ (সুরা : মুমিন, আয়াত : ২৮)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, ‘ সত্যবাদিতা হচ্ছে শুভ কাজ। আর শুভ কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর বান্দা যখন সত্য বলতে থাকে, এক সময় আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত হয়। আর মিথ্যা হচ্ছে পাপাচার, পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, বান্দা যখন মিথ্যা

বলতে থাকে, আল্লাহর কাছে এক সময় সে মিথ্যুক হিসেবে গণ্য হয়'। (বুখারি : ৫৭৪৩, মুসলিম : ২৬০৭)।

★ **চুরি-ছিনতাই, সন্ত্রাসী :-** চুরি জঘন্যতম সামাজিক অপরাধ। সমাজের যে কোন স্তরের মানুষ চুরির সাথে জড়িত থাকে কিন্তু আমাদের সমাজে শুধু মাত্র ছিঁচকে চোরদের অপরাধী ভাবা হয়। অপরদিকে ক্ষমতা ও অর্থের প্রভাবে সমাজের উঁচু স্তরের চোররা সাধারণত নাগালের বাইরেই থেকে যায়। চুরি যেমন নিরক্ষর অশিক্ষিত মানুষ জীবিকার জন্য করে থাকে,তেমনি উঁচু পর্যায়ের শিক্ষিত মানুষজন আয়েশি জীবনযাপনের জন্য করে থাকে। একটা ছোট বাচ্চা যখন কোন জিনিস চুরি করে এনে বাবা মায়ের কাছে দেয়,সেই বাবা মা জিনিসটা কোথায় পেলো! কিভাবে পেলো! এসব জিজ্ঞেস না করে বরং পাওয়ার আনন্দে খুশি হয়। যারফলে বাচ্চাদের অবচেতন মনে ঢুকে যায় যে এভাবে অন্যের জিনিস না বলে নেওয়া বা চুরি করা হয়তো ভালো কাজ। চুরি করার পেছনে অনেক ধরনের কারণ আছে। যেমন কেউ আর্থিক সমস্যার কারণে চুরি করে, কেউ বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য চুরি করে, কেউ স্বভাব দোষে চুরি করে ইত্যাদি। চুরি সাধারণত লোকচক্ষুর আড়ালে করা হলেও ছিনতাই অনেকসময় লোকজনের উপস্থিতিতে করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে মানুষজনের কাছে উপস্থিত টাকা পয়সা, গহনা বা মূল্যবান জিনিসপত্র জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। রাত কিছুটা গভীর হলেই নির্জন রাস্তায় ছিনতায়কারীরা ওঁৎ পেতে থাকে এবং সুযোগ বুঝে অসহায় যাত্রী বা পথচারীদের পথ অবরোধ করে ছিনতায় করে।

অপরদিকে চুরি-ছিনতাইকারীরাই একসময় আস্তে আস্তে ভয়ংকর সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে সমাজে লোক সম্মুখে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে ভীত হয়ে এলাকা বা মহল্লার মানুষজন বিভিন্ন ধরনের চাঁদা দিতে বাধ্য হয়। যা দিনে দিনে একপ্রকার বেড়েই চলছে।

সন্ত্রাস ও ডাকাতির শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদগুলো বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।' (সুরা : আল মায়েদা, আয়াত : ৩৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে, 'আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা শুধু অশ্লীল বিষয়গুলো হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং তিনি হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আর আল্লাহর সঙ্গে এমন বস্তু অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩৩)

★ **সুদ, ঘুষ :-** বর্তমান সমাজে মানুষ দ্রুত মুনাফা লাভের আশায় বিপুল হারে সুদের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে সুদের মাধ্যমে লাভের পরিমাণ বেশি মনে হলেও পারতপক্ষে ক্ষতির পরিমাণই বেশি হয়। উচ্চহারে সুদের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে অনেকেই সব হারিয়ে পথে বসার উপক্রম হয়। অপরদিকে সুদ দাতা মহাজন কোন পরিশ্রম ছাড়াই মাসের পর মাস টাকা পায় বলে নিশ্চিন্তমনে বসে থাকে। এবং কেউ সুদের টাকা দিতে না পারলে তাকে ভিটেমাটি ছাড়া করে।

সুদের পাশাপাশি সমাজে ঘুষের প্রচলন বেড়েই চলেছে। চাকরি পেতে বা কোন কাজ সহজে এবং দ্রুত সমাধান করতে ঘুষের প্রচলন ব্যাপক। বেশিরভাগ সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীগন ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে থাকে। উপায়ন্তর না থাকায় সাধারণ মানুষজন তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। এছাড়াও অন্যায়ভাবে কোন কাজ করার জন্যে ঘুষের বিকল্প নেই। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ঘুষের প্রচলন বেড়ে চলেছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা

না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না।'(সুরা বাকারা ২৭৮-২৭৯)

আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- 'সুদের তিয়াত্তরটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্নটি হলো নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করার সমতুল্য। আর অপর ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা সবচে' নিকৃষ্ট সুদ। (মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭)

ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- 'যখন কোনো জনপদে সুদ ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর আজাব বৈধ করে নেয়।(মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং জেনে-বুঝে মানুষের সম্পদ থেকে ভক্ষণের জন্য বিচারকদের দরবারে উহার আরযী পেশ করো না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৮]

আবদুল্লাহ ইবনে আস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) ঘুষ দাতা ও গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৫৮০)

★ **মদ্যপান, জুয়া :-** কিছুকাল আগেও মদ মানুষের কাছে দুর্লভ বস্তু ছিলো। কিন্তু এখন আনাচে কানাচে মদ্যপদের সংঘবদ্ধ প্ররোচনায় মদের নাগাল পাওয়া সহজ হয়ে গিয়েছে। যারফলে তরুন প্রজন্মের বেশিরভাগই এই নেশাদ্রব্যের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। এরজন্যে অভিভাবকদের অসচেতনতা পুরোপুরি ভাবে দায়ী। তরুন প্রজন্ম ছাড়াও বিভিন্ন বয়সের মানুষ নিষিদ্ধ এ দ্রব্যতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। মদের পাশাপাশি জুয়ার আসরে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। লোভের বশবর্তি হয়ে জুয়া খেলে নিজের অর্থ সম্পদ নষ্ট করছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া আর আস্তানা ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত শয়তানী কাজ, তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সাফল্যমন্ডিত হতে পার"। (সূরাআল-মায়িদাহ ৫ঃ ৯০)

আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করেছে অতঃপর তাথেকে তওবা করেনি, সে আখিরাতে তাথেকে বঞ্চিত থাকবে। (মুসলিম ৩৬/৮)

আল্লাহ বলেন, "লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এতদোভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য অপকারও, কিন্তু এগুলোতে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি" (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২১৯)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, এগুলো শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো' (সুরা-৫ মায়েদা, আয়াত: ৯০)।

★ **মারামারি-হত্যা :-** সমাজ যেন বিশৃঙ্খলার দিকে আরো একধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। মারামারি, হত্যা এসব নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জোর যার মুল্লুক তার এই যেন অবস্থা। সমাজের কর্তৃত্ব স্থাপনকারী একাধিক দল থাকলে তাদের মাঝে মারামারি, একে অপরকে হত্যা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা বর্তমানে। আর যেহেতু রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থায় গাফিলতি পরিলক্ষিত হয় তাই মানুষ মানুষকে হত্যা করতে দ্বিতীয়বার ভাবে না। এভাবেই সমাজের মধ্যে কোন্দল বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন।

কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে আল্লাহপাক বলেছেন : তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে। (সূরা নিসা : ৯৩)।

আল্লাহ তায়ালা আলো বলেন,নরহত্যা বা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য কেউ কাউকে হত্যা করল সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করল সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। (সূরা মায়েদা : ৩২)।

★ **অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগদখল** :- ক্ষমতার জোর যার আছে সবকিছু যেন তারই এমন নীতিতেই সমাজ চলছে বর্তমানে। মানুষ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগদখল করে নিজের ক্ষমতার জানান দিচ্ছে। এমনকি নিজের রক্ত সম্পর্কিত আত্নীয় স্বজনরা ও বাদ যাচ্ছেনা। অতি সহজেই একভাই আরেক ভাইয়ের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে নিচ্ছে। বোনদেরকে তাদের প্রাপ্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছে। এভাবে সমাজের মানুষের মনুষ্যত্ব ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,   ‘হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না। শুধু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা কোরো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।’ (সুরা : নিসা, আয়াত : ২৯)

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন,   ‘হারাম সম্পদ দ্বারা যে শরীর গঠিত হয়, তা জাহান্নামে জ্বলবে।’

রাসূল সা: বলেছেন, কারো এক বিঘত সম্পদ যদি কেউ আত্মসাৎ করে তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তার গলায় সাত স্তবক জমিন ঝুলিয়ে দেবেন। ধসাতে থাকবেন তাকে।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের মান-সম্মান, রক্ত, সম্পদ সব কিছু হারাম। (সহীহ বুখারী হা: ৬৮, সহীহ মুসলিম হা:১৬৭৯

★ **ভোগবাদী মনোভাব :-** আমাদের সমাজে আইন কানুন,রাজনীতি,নীতি নৈতিকতার জ্ঞান,বিবেকবোধ জাগানো আদর্শের বাণী,ধর্মীয় দর্শন সবই রয়েছে, যার দ্বারা গড়ে ওঠার কথা একটি আদর্শ মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা।কিন্তু,বাস্তবে এর বিপরীতে গড়ে উঠেছে একটি নীতি বিবর্জিত অমানবিক সমাজ ও অনিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা।সকল প্রকার আদর্শের বাণী এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুরদের স্বার্থ সিদ্ধির মুখের বুলি সর্বস্ব বিজ্ঞাপন।যার বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যবহার ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রায় অনুপস্থিত।একটি উচ্চ পর্যায়ের ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের বসবাস।ভোগই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও

রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম ভোগবাদী জীবন নিশ্চিত করাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত।ভোগের জন্যই আমাদের শিক্ষা অর্জন করা, রাজনীতি করা, ব্যবসা বাণিজ্য করা, চাকুরী করা এবং ভোগের জন্যই রাষ্ট্র পরিচালনা করা ।একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে একজন সৎ, সমাজ সচেতন, কর্মক্ষম এবং স্বনির্ভর মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে রাষ্ট্র ও সমাজের সেবা করার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে সুন্দর ভাবে উপভোগ করা। কিন্তু, আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জনের

লক্ষ্য স্থির হয় শিক্ষা জীবন শেষে একটি ভালো উপার্জনের পেশা নিশ্চিত করে অর্থ বিত্ত উপার্জনের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।কারণ,আমাদের দেশের সামাজিক মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড অর্থের মাপকাঠিতে নির্ধারিত,সততা ও ত্যাগের উপর নয়।

আর,সেই লক্ষ্যে অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে শিক্ষা জীবন শেষ করা একজন ব্যক্তি যখন কর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন নির্ধারিত পারিশ্রমিক বা বেতনের বাইরে অতিরিক্ত উপার্জনের পথ খুঁজতে হন্য হয়ে ছোটে।ফলে, তার কর্ম বা সেবার মান উন্নয়নের চেয়ে অর্থ দ্বারা পকেট ভারী করার দিকে অধিক মনোনিবেশ ঘটায়।প্রত্যেকেরই সীমার রশি ছিঁড়ে ইচ্ছে মত যা খুশী তাই করে শীর্ষে অবস্থানের অসুস্থ কামনা বাসনা।

অসুস্থ ভোগবাদী মানুসিকতা ও সমাজ ব্যবস্থার কারণে আমরা সবাই একে অপরকে বিষ খাওয়াচ্ছি এবং খাচ্ছি,ধোঁকা দিচ্ছি এবং ধোঁকা খাচ্ছি, অন্যয় করছি এবং অন্যায়ের স্বীকার হচ্ছি কিন্তু তবুও আমাদের বোধের দুয়ার খুলছে না আত্মকেন্দ্রিক ভাবনার কারণে। আমাদের অদূরদর্শী চিন্তার ফলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর ফাঁদ বানিয়ে একটি ভয়ংকর সমাজ গড়ে তুলে সমগ্র জাতিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিতে সামগ্রীক ভাবে সহায়তা করে যাচ্ছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: আর তোমাদের অর্থ-সম্পদ অপ্রোয়জনীয় কাজে খরচ করবে না। জেনে রেখো, যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই, আর শয়তান নিজ প্রতিপালকের ঘোর অকৃতজ্ঞ। (সুরা বনি ইসরাইল-২৬ :২৭)

হাদিসে এসেছে, 'যা ইচ্ছা পানাহার করো এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। (এক) তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশি না হওয়া চাই এবং (দুই) গর্ব ও অহংকার না থাকা চাই। [বুখারী] তবে এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বাভাবিক সীমা দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর নবি (স.) বলেছেন, 'আদম সন্তান যে সমস্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করে, তন্মধ্যে পেট হল সবচেয়ে খারাপ। আদম সন্তানের জন্য স্বল্প কিছু লোকমাই যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার পিঠ সোজা রাখতে পারে। এর বেশি করতে চাইলে এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য যেন নির্দিষ্ট করে।' [তিরমিযী ২৩৮০, ইবন মাজাহ ৩৩৪৯, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৩২]

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। (সুরা ফুরকান : ৬৭)।

কোনো ব্যক্তি অপচয় বা অপব্যয় করে শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সে আল্লাহর আদেশ ভুলে অপচয়ে মত্ত হয়ে থাকে। মনের খাহেশের পূজারি হয়ে ওঠে। এ জন্য পবিত্র কোরআনে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৭)

★ **নারীবাদিতা:-** নারীবাদের মূল প্রতিপাদ্য হলো সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন। একের ওপর অন্যের কর্তৃত্ব নয়। তবে পুরুষের ওপর নারীর কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে পুরুষ কর্তৃক নারীর ওপর সহস্র বছরের নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই দেখতে হবে। নারীবাদিতা মূলত নারীদের ধোঁকা দেয়। কারণ পশ্চিমা সভ্যতা নারীদের মনে নারীবাদিতার বিষবাষ্প ছড়ালেও তারা নিজেরাই নারীদের যথাযথ মূল্য দেয়না।

বিশ্ব মোড়লরা চায় নারীরা স্বাধীনতার নামে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসুক যাতে করে তাদের মাধ্যমে ফিতনা ছড়ানো যায়। নারীদের পন্য হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। একপ্রকার ধোঁকায় পড়ে নারীরা এই নারীবাদিতার বুলি আওড়ায়।

বিপরীতে ইসলাম নারীদের সব চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে। যথাযথ ভাবে নিরাপত্তা ও নিশ্চিত করে। মা,মেয়ে,বোন হিসেবে আলাদা আলাদা ভাবে অধিকার নিশ্চিত করেছে।

মা হিসেবে ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন,   'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বলেন, এর পরও তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বলেন, তার পরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বলেন, এরপর তোমার পিতা। (মুসলিম, হাদিস : ৬৩৯৪)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড় (প্রতিবন্ধক) হবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১৩)

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারই তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলে জান্নাতে যাবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১২)

রাসূলের (স.) আগমনের পূর্বে ধন-সম্পত্তিতে নারীদের কোন উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না। ইসলামই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির হকদার পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও প্রধান করে।পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও স্বামীর সম্পত্তিতে রয়েছে নারীর সম্মানজনক অধিকার। যেকোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা যে অর্থসম্পদ উপার্জন করবেন এবং

উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন-সম্পদের অধিকারী হবেন, এতে ইসলাম নারীকে পুর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।' (সুরা নিসা, আয়াত: ৭)

★ **ফ্রী মিক্সিং তথা নারী পুরুষের একত্রে অবাধ বিচরণ :-** সমাজের ভয়াবহ এক ফিতনার নাম ফ্রী মিক্সিং তথা নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রায় সকল কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা পরিলক্ষিত হয়। লোহা ও আগুন যেমন পাশাপাশি সহবস্থান করতে পারেনা,আগুনের উত্তাপে গলে পড়ে, তেমনি নারী পুরুষের পাশাপাশি অবস্থান হওয়াই খুব সহজে একে অপরের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজে অশ্লীলতায় ছেয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন"। (সূরা আন-নূর ৩০)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "কোনো মুসলিমব্যক্তি কোনো নারীর সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাল, এরপর সে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ইবাদতের এমন স্বাদ দান করবেন, যা সে অনুভব করবে"। (মুসনাদে আহমাদ ২২২৭৮)

★ **যিনা-ব্যভিচার :** সমাজের বর্তমান চিত্র দেখলে এখন যিনা ব্যভিচার খুবই সুলভ এবং সহজ কাজে পরিনত হয়েছে। আগে যদি মন এগুলোকে ঘৃণিত কাজ হিসেবে ধরা হতো, এখন বর্তমানে সবাই সাধারণ ভাবেই মেনে নেয়। অবিভাবকগন সন্তানদের জন্য হারাম যিনার পথ উন্মুক্ত করে দিলেও হালাল বিয়ের পথ কঠিন করে তুলেছে। পাত্রের গাড়ি -বাড়ি, ভালো চাকরী না থাকলে বিয়ের কথা মাথায় আসাও যেন ভুল। এছাড়াও

বিয়েতে জাকজমকপূর্ন আয়োজন না হলে চলেনা, যাতে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এরফলে মানুষ বিয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে হারাম যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে অনায়াসেই।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে বেভিচার প্রসার লাভ করুক,তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রনা দায়ক শাস্তি রয়েছে,আল্লাহ্ জানেন ,তোমরা জান না। (সুরা আন নুর-১৯)

ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- ‘যখন কোনো জনপদে সুদ ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর আজাব বৈধ করে নেয়।(মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭)

★ **সমকামীতা:** সমকামীতা বলতে একই লিঙ্গের মানুষের পরস্পরের প্রতি যৌন আকর্ষণ কে বুঝায়। এটি যিনার চেয়েও নিকৃষ্ট পাপাচার। আমাদের সমাজে এটি সচরাচর নিষিদ্ধ থাকায় সমকামীদের দেখা যায়না। কিন্তু আরা আত্নগোপন করে তাদের মতাদর্শ প্রচার প্রসার করে যাচ্ছে এবং সমকামীতার বৈধতার জন্যে বিভিন্ন আইন পাশের জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে। যা আমাদের সমাজ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল- তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি?’ (সুরা আরাফ : আয়াত ৮০)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, অত:পর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ৮৩)

ইরশাদ হয়েছে, "সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরূষদের সাথে কুকর্ম কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য সঙ্গিনী হিসেবে যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়"। (সূরা শুয়ারা ২৬:১৬৫-১৬৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা কাউকে লুত সম্প্রদায়ের কাজ (সমকামিতায়) জড়িত দেখলে; যে করে এবং যার সঙ্গে করা হয় উভয়কে হত্যা কর।’ (তিরমিজি)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, “কাউকে সমকাম করতে দেখলে তোমরা উভয় সমকামীকেই হত্যা করবে”।(সুনানে আবু দাউদ ৪৪৬২)

★ **ট্রান্সজেন্ডার তথা লিঙ্গ রুপান্তর:** ট্রান্সজেন্ডারের বিষবাষ্প বর্তমানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই বিষয় টা এতোটা ভয়াবহ যে একজন ছেলে নিজের প্রয়োজন ও সুযোগ সুবিধার জন্যে নিজেকে মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিবে,মেয়েদের ক্ষেত্রে ও তাই। কোন ছেলে মুখে বললো যে যে মেয়ে তাহলেই সে মেয়ে, আবার কোন ছেলে মুখে বললো সে ছেলে তাহলেই সে ছেলে। এটি মূলত সমকামীতার আরেকটি এজেন্ডা। ট্রান্সজেন্ডার রা মূলত নিজেদের হিজরা শ্রেণির সাথে সাদৃশ্য দেখিয়ে নানা রকমের সুযোগ ভোগ করার চেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার ও হিজরা সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন অনেক ছেলে-মেয়েরা সার্জারীর মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারে রুপান্তরিত হচ্ছে। যা সমাজে একেবারে বিধ্বংসী প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি (আল্লাহ) মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে। ’ (সুরা : ত্বিন, আয়াত : ৪)

মহান আল্লাহ মানুষকে যে স্বাভাবিক দেহাবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেটাই তার জন্য উৎকৃষ্ট নিয়ামত। ইসলামী বিধি-বিধানের বাইরে গিয়ে একে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকার কারো নেই।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির পরিবর্তন-পরিবর্ধনকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল (সা.) নারীর বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের অভিসম্পত করেছেন। ’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৭৮৫)

০৬. প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সদা পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্নরকম শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানতঃ প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর - এই তিন স্তরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় ৬ (শিশু শ্রেণিসহ) বছর মেয়াদি প্রাথমিক (৮ বছর মেয়াদী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে), ৫ বছর মেয়াদি মাধ্যমিক ও ২ বছর মেয়াদি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে। উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ৩-৫ বছর মেয়াদি; যা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ৩৭টি পাবলিক ও ৯০টিরও বেশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তত্ত্বাবধানে অধিভুক্ত কলেজের (ঢাকার ৭টি সরকারী কলেজ বাদে) মাধ্যমে দেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তাদের পছন্দ অনুসারে বাংলা বা ইংরেজির মধ্যে যেকোনটিকে বেছে নিতে পারে।

বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে মুখস্থ নির্ভর ভিত্তিক পড়াশোনা শুরু হয়েছে। মেধা বিকাশের চেয়ে মুখস্থ করে বেশী নাম্বার পাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর ধীরে ধীরে নীতি নৈতিকতা ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিয়ে যুক্ত করা হচ্ছে অসংগতিপূর্ণ বিষয় সমূহ। উদাহরণ স্বরুপ মাধ্যমিক শ্রেণির বইয়ের কিছু পাঠে খুব কৌশলের সাথে ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ রুপান্তর এর ধারণা যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোর কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালে গোপনীয় বিষয় গুলো ফলাও করে তাদের পাঠে যুক্ত করা হয়েছে। "এসো বন্ধু হই" শিরোনামে একটি পাঠ যুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের মাঝে অবাধ মেলামেশার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। " ধর্ম যার যার উৎসব সবার " এই শিরোনামে মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিরক ও কুফরের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বইয়ের ভেতরে বিদ্যমান বিভিন্ন ফুলের ছবি, মসজিদের ছবি তুলে দিয়ে তার স্থানে মন্দিরের ছবি ও বিভিন্ন ধরনের মূর্তির ছবি ছাপানো হয়েছে। বিবর্তনবাদের বিষ শিক্ষার্থীদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।যার ফলে তারা মনে করছে তাদের পূর্বপুরুষ বানর ছিলো। এবং কালের পর কাল বিবর্তন হয়ে বানর থেকে মানুষ

হয়েছে। যা সরাসরি ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। সর্বপরি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্য সকল ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জিপিএ বা সিজিপিএ ভিত্তিক ফলাফল নির্ধারণ শিক্ষার্থীদের গৎবাঁধা পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতা হারাচ্ছে এবং একপ্রকারের মেধা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এই পর্যায়কে আরো সুদৃঢ় করতে পাঠ্যক্রমে বর্তমানে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু যুক্ত করা হচ্ছে। যেমন কিভাবে ভাত রান্না করতে হয়,কিভাবে ডিম ভাজতে হয়,কিভাবে আলূ ভর্তা করতে হয় ইত্যাদি বিষয় গুলো শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে গিয়ে সরাসরি শিখছে, যা জীবন ঘনিষ্ট হলেও বিদ্যালয়ে গিয়ে শিখার মতো নয়। বর্তমানে ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে কিশোর, প্রাপ্তবয়স্ক সবাই ফোনের নেশায় বুদ হয়ে আছে। ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে বিভিন্ন কনটেন্ট দেখে ব্যাপক সময় নষ্ট করছে। কিন্তু পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের ফোনের আসক্তি থেকে দূরে রাখার বদলে আরো ফোনের আসক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে।ফোন ভিত্তিক বিভিন্ন কাজ করতে দিচ্ছে যার ফলে অনলাইন ও ইন্টারনেটে তারা অবাধ বিচরণ করছে। এমনকি নিষিদ্ধ সকল সাইটে তারা বিভিন্ন ধরনের খারাপ ছবি, ভিডিও ইত্যাদিতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। এককথায় মেরুদণ্ডহীন জাতি গঠনের সকল প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন উপায়ে ইসলাম থেকে দূরে রাখা এবং শিশুমনে নাস্তিকতার বীজ ঢেলে দিচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের একাংশ ধর্ম বিমুখ হয়ে যাচ্ছে।

০৭. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে রাষ্ট্র সমাজ গঠন

বর্তমানে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সমাজ গঠিত হলে সামাজিক কাঠামো পুরোপুরি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ আনীত এই পাঠ্যপুস্তক একটা মেরুদণ্ডহীন জাতি গঠন করছে। যার ফলে মেধাবী, নীতি-নিষ্ঠাবান, ইসলামের আলোকে আলোকিত মানুষ তৈরী হচ্ছেনা বললেই চলে। ভোগবাদী জীবনব্যবস্থায় মানুষ শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করছে যাতে বেশি টাকা অর্জন করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করা যায়।। মানুষ মুখে দেশপ্রেমের বুলি আউড়ালেও উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশে গমন করে এবং একপর্যায়ে সেই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সমাজ গঠিত হলে আমাদের সন্তানদের মাঝে যে সমস্যা গুলো দেখা যাবে:-

- নীতি নৈতিকতাহীন একটি জাতি গঠিত হবে।
- মিথ্যাচার ও প্রতারণায় পরিপূর্ণ সমাজ ও জাতি গড়ে উঠবে।
- নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে যেমন সন্ত্রাস,হত্যা, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি।
- জীবনে জবাবদিহিতার কোন পরোয়া করবেনা যার ফলে বিভিন্ন নানা রকমের নেশাদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।
- অসৎপথে রাতারাতি ধনী হওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকবে যারফলে জুয়ার মতো নিকৃষ্ট পাপাচারে জড়িয়ে পড়বে।
- ক্ষমতার জোরে একে অপরের সম্পদ জবরদখল করবে।
- ভোগবাদী মনোভাব বিরাজ করবে বলে এবং অর্থ উপার্জনের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটবে।
- নারীবাদের মতো ভয়াবহ মতবাদে নারীরা বিশ্বাসী হয়ে মরিচিকার পেছনে ছুটবে। আর এর ফায়দা হিসেবে স্বার্থান্বেষী মহল সুবিধা ভোগ করবে।

- নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে জিনা-ব্যভিচারের দ্বার উন্মোচিত হবে। একপর্যায়ে মানুষের হায়া উঠে যাবে তখন চক্ষুলজ্জাও বিরাজ করবে না।
- সমকামীতার মতো রাষ্ট্র ও সমাজ নাশক মতবাদ প্রতিষ্ঠা পাবে। যাতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে।
- ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। যেকোন সময় ছেলেরা নিজেদের নারী বলে দাবী করবে এতে করে সত্যিকারের নারীরা ট্রান্সজেন্ডার নারী তথা পুরুষদের দ্বারা নির্যাতনের স্বীকার হবে।
- ধর্মনিরপেক্ষতার পেছনে ইসলাম বিদ্বেষ প্রকাশ পাবে। যাতে ঈমান ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে।
- একপর্যায়ে সন্তানরা পিতামাতাকে মান্য করবেনা এমনকি বৃদ্ধ বয়সে তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতেও নূন্যতম দ্বিধায় ভুগবেনা।
- নাস্তিকদের টার্গেটে পরিণত হয়ে একসময় ঈমান হারিয়ে নাস্তিক হয়ে যাবে।
- ছোট বড় কারো সাথেই ব্যবহারের সৌন্দর্য প্রদর্শিত হবেনা। এককথায় সুন্দর আখলাক বিবর্জিত জাতি গঠিত হবে।

০৮. কুরআনের আলোকে রাষ্ট্র সমাজ গঠন

সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজন কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল কুরআন। স্রষ্টার মহাদান, রাসূল (সা)-এর শ্রেষ্ঠ মোজেজা, বান্দার জন্য রহমতের ভান্ডার। সর্বোপরি বিশ্বমানবতার মুক্তির মহাসনদ। কুরআন এমন একটি কিতাব যা তিলাওয়াত করলেও সওয়াব, শুনলেও সওয়াব, শিখলেও সওয়াব, শেখালেও সওয়াব, আমল করলেও সওয়াব, কাউকে আমল করতে উৎসাহিত করলেও সওয়াব। কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শহীদ হলেও সওয়াব, গাজী হলেও সওয়াব।

পৃথিবীতে কুরআন ছাড়া এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা তার অনুসারীদেরকে এভাবে উজ্জীবিত করে।

কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য:

১.সঠিক পথনির্দেশনা- কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদের ঘোষণা এবং দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দানের নিমিত্তে আল্লাহ তায়ালা আল কুরআন অবতীর্ণ করেন।

২.সমস্যার সমাধান- বিশ্বমানবতা যখন চরম সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত, যখন বিশ্বমানবতা আশা করছিল ওপরের ফয়সালা, ঠিক তখনিই আল্লাহ তায়ালা সব সমস্যার সমাধানকল্পে আলোকবর্তিকা রূপে কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ করেন।

৩.সতর্কবার্তা প্রদান- কুরআন আল্লাহপ্রদত্ত সব নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি অতীতের হটকারী জাতিগুলোর ভুলের শোচনীয় পরিণামসমূহ উল্লেখের মাধ্যমের মানবসমাজকে সতর্কতা প্রদানের নিমিত্তে আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়।

৪.ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন- ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজের লোকেরা বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করত। নিজেদের মনমতো বিধান তৈরি করে জীবন অতিবাহিত করত। তারা ছিল চরম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাদের সে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা খন্ডনের নিমিত্তে কুরআন অবতীর্ণ হয়।

৫. ইসলামী সমাজের রূপরেখা প্রণয়ন- মানবরচিত সব মতাদর্শ উৎখাত করে ইসলামী সমাজের বাস্তব রূপরেখা প্রণয়ন তথা কুরআনের বিধান কায়েম করা। বস্তুত এটাই ছিল কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য।

৬.শিরকমুক্ত সমাজ গঠন- আল-কুরআন নাজিলের পূর্বে মানবতা ছিল জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শিরক, কুফর আর নিফাকিতে সয়লাব ছিল মানবসমাজ। কুরআন এসেই বিশ্ববাসীকে এসব মুনকার কাজ থেকে মুক্ত করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথনির্দেশ প্রদান করে।

৭. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা- অন্যায়, জুলম-অত্যাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘনে বিশ্বমানবতা অস্থির। আর এ জন্য দরকার ন্যায় ও ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কুরআন নাজিলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৮. রবের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন- প্রতিটি মুমিনেরই একান্ত কামনা থাকে তার মনিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ। কুরআন এ কামনা পূরণে পথনির্দেশ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।

৯. সত্যায়নকারী- সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। এর আগে অনেক আসমানি কিতাব ও অগণিত নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন। কুরআন এসে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলসহ আল্লাহপ্রদত্ত আসমানি কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করেছে।

১০.তাজকিয়ায়ে নফস- সর্বোপরি দুনিয়ার সব কর্মকান্ডে বান্দার আত্মপরিশুদ্ধি লাভে কুরআন এক কার্যকর টনিক হিসেবে অবতীর্ণ হয়।

কুরআনি সমাজ কেন দরকার?

কুরআনি সমাজ মানে আল্লাহর অহির দিকনির্দেশনার আলোকে সমাজ পরিচালিত হবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর হেদায়েতের অনুসরণের বিকল্প নেই। আল্লাহর রাসূল হিলফুল ফুজুল করেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। হেরাগুহায় ধ্যান করেছিলেন। অহি দিয়ে ২৩ বছরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুন্দরী রমণী ঘর থেকে একাকী বের হতে পারতো। জাকাত নেয়ার মতো লোক ছিল না। হযরত আবদুল আজিজ ছেলেকে রাষ্ট্রীয় তহবিলের একটি খেজুর দেননি আল্লাহর ভয়ে। ব্যক্তিগত কথা বলার সময় রাষ্ট্রেীয় অর্থের বাতি নিভিয়ে রাখতেন। কুরআনি সমাজ ছাড়া এমন সুখ পাওয়া যায় না।

কুরআনি সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য: কুরআনি সমাজ মানে আইন হবে আল্লাহর। জনগণের পরিবর্তে সার্বভৌমত্বের মালিক হবেন আল্লাহ। রাষ্ট্র ইসলামী চিন্তাবিদদের ইজতিহাদের আলোকে বিস্তারিত আইন কানুন করবে। মানবরচিত আইন প্রণেতারা সুদূরপ্রসারী ভালো-মন্দ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কারণ তারা গায়েব জানেন না। ভবিষ্যতে মানবসমাজের সুখ কিসে নির্ভর তা তিনিই বলতে পারেন; যিনি আলেম আল গায়ব।

কুরআনি সমাজ মানে রাষ্ট্রের সর্বত্র আদল তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। রাষ্ট্রনায়কও আইনের ঊর্ধ্বে থাকবেন না। বর্তমান প্রচলিত আইনে রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্ব পালনকালে আইনের ঊর্ধ্বে। হযরত আলী (রা)-এর সাথে ইহুদির মীমাংসার জন্য খলিফা আদালতে গিয়েছিলেন। আদালত প্রভাবান্বিত করেননি। রাষ্ট্র মানুষের ওপর কোন জুলুম করবে না। এক মানুষ আরেক মানুষের ওপর জুলুম করা থেকেও বিরত থাকবে।

কুরআনি সমাজ মানে সমাজের সকল মানুষ নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। রাষ্ট্রনায়করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলে তাদের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকরা চেষ্টা করবে।

কুরআনি সমাজ মানে সে সমাজের কেউ দুনিয়ার কোনো সত্তাকে ভয় পাবে না। একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ইসলামের শৌর্য-বীর্য বিসর্জন দেবে না। প্রয়োজনে শাহাদাত বরণ করবে।

কুরআনি সমাজ মানে সে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে পরামর্শভিত্তিক। ক্ষমতাসীনরা স্বেচ্ছাচারী হবেন না।

কুরআনি সমাজ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে:

কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সে পথ ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যে পথ ও কর্মপদ্ধতি প্রিয় নবী হয়রত মুহাম্মদ (সা) অনুসরণ করে তদানীন্তন সমাজে কুরআনের রাজ কায়েম করেছিলেন। কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাসূলে কারিম (সা)-এর সুন্নাহ বোঝার জন্য যেমনিভাবে কুরআন ও হাদিসের ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে, তেমনিভাবে কোন প্রেক্ষাপটে কুরআন ও হাদিসের সে বিধান নাজিল হয়েছিল তাও জানতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদিসের অনেক বিধান মুহকাম তথা সুস্পষ্ট। তা সময় ও যুগের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন হয় না। যেমন মদ হারাম হওয়ার বিষয়। আবার কিছু বিষয় আছে তা কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইজতিহাদের সাথে নির্ভরশীল। যেমন বদর যুদ্ধের

বন্দীদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে আজকের যুগে বন্দীদের সাথে হুবহু কি সেই আচরণ করতে হবে? না সময় ও স্থানের আলোকে ইসলামী নেতৃত্ব নির্ধারণ করতে পারবেন? এটা ঠিক যে কুরআন হাদিসের আলোকে ইসলামী নেতৃত্বকে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তিনি কুরআন ও হাদিসের টেক্সট ও পাশাপাশি কনটেক্সট যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ কি তা ভালোভাবে বুঝতে হলেও কুরআন হাদিসের এ-সংক্রান্ত টেক্সট ও কনটেক্সট যথাযথভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কুরআন ও হাদিসের মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদ আযিমত ও রুখসত অর্থাৎ কঠিন ও সহজ পন্থার যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন। তবে সহজ এমন কোনো পন্থা আবিষ্কার করা যাবে না যা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক।

মানব সমাজ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একদল আল্লাহকে স্বীকার করে ও তাঁর বিধান মেনে চলে। আরেক দল নিজেদের সীমিত জ্ঞান তথা প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের পূজা করে ও যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলে। উভয় দল পৃথকভাবে বা একত্রিতভাবে সমাজে বসবাস করে। উভয় দলের মধ্যেই রয়েছে কট্টরপন্থী, মধ্যপন্থী ও শৈথিল্যবাদী। সবাইকে নিয়েই সমাজ। আর সমাজ নিয়েই মানুষ। প্রত্যেকে একে অপরের মুখাপেক্ষী। তাই সমাজ গঠনের ও তা পরিচালনার জন্য মানুষকে সর্বদা উচ্চতর জ্ঞানী ও শক্তিমানের অনুসারী হতে হয়। আর এটা আল্লাহরই চিরন্তন ব্যবস্থাপনা। যখন কোন সমাজ ও সমাজ নেতা আল্লাহর দাসত্ব করে ও তাঁর বিধান মতে চলে, তখন সেই সমাজ হয় উত্তম সমাজ। আর যখন তার বিপরীত হয়, তখন সেটি হয় নিকৃষ্ট ও শয়তানী সমাজ। তবে যেকোন সমাজে যেকোন সময় একই ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব ও শয়তানের দাসত্ব দু'টিই করতে পারে। সমাজের দায়িত্ব হবে তখন শয়তানী তৎপরতাকে রুখে দেওয়া ও মানবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। এভাবে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে উত্তম সমাজ গঠিত হবে। আর উত্তম সমাজ কাঠামোর মধ্যেই উত্তম ব্যক্তি ও পরিবার গড়ে ওঠা সহজ

হয়। সমাজের বৃহত্তম রূপ হ’ল রাষ্ট্র। আর রাষ্ট্র সমূহের ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর রূপ হ’ল বিশ্বরাষ্ট্র। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বরাষ্ট্র সবই উত্তম হবে যদি উত্তম নীতিমালা ও উত্তম ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা তা পরিচালিত হয়। আর যদি অনুত্তম নীতিমালা ও অনুত্তম ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা তা পরিচালিত হয়, তবে সেই পরিবার ও সমাজ নষ্ট সমাজে পরিণত হবে। ঐ রাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্রে পর্যবসিত হবে। যেমন বর্তমান শতাব্দীতে অধিকাংশ রাষ্ট্র কার্যতঃ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: https// dr-mobarakhossin.com

কুরআনি সমাজের ভিত্তি :

১. তাওহীদ: উত্তম সমাজের ভিত্তি হবে নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসের উপরে। কেননা দৃঢ় ও নিখুঁত ভিত্তি ব্যতীত নিখুঁত ও মযবূত ইমারত দাঁড় করানো যায় না। ভিত বাঁকা বা দুর্বল হ’লে ইমারত ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। সেকারণ সর্বাগ্রে এই বিশ্বাস মযবূত করতে হবে যে, আমরা স্বেচ্ছায় দুনিয়াতে আসিনি। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট মেয়াদ, কর্ম ও রিযিক দিয়ে। যেমন কারখানায় ঔষধ তৈরী হয় নির্দিষ্ট উপাদান, মেয়াদ ও কার্যকারিতা দিয়ে। নিয়ম মাফিক ঔষধ সেবন না করলে ও তার আনুষঙ্গিক বিধান না মানলে যেমন সুস্থ দেহ আশা করা যায় না, তেমনি আল্লাহর বিধান যথাযথভাবে না মানলে সুস্থ সমাজ আশা করা যায় না। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ তাই সর্বাগ্রে আক্বীদা সংস্কার করেছেন এবং শিরকী আক্বীদার স্থলে তাওহীদী আক্বীদার বীজ বপন করেছেন। যাতে মানুষ মানুষের গোলামী ছেড়ে আল্লাহর গোলামীর অধীনে সকলে সমানাধিকার ভোগ করে।

স্বার্থপর সমাজনেতা ও তাদের সাথী কায়েমী স্বার্থবাদীরা সকল যুগে সর্বশক্তি নিয়ে নবীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেযুগে ছিল সামন্ততন্ত্র, এ যুগে এসেছে গণতন্ত্র। যার চাইতে বড় প্রতারণা এখন আর নেই। অতীত ও বর্তমানের সকল মন্ত্র-তন্ত্রের

সারকথা হ'ল সমাজ বা রাষ্ট্রনেতাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সংসদীয় গণতন্ত্রে দলনেতা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সবকিছু। জনগণের নামে তিনিই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ভোগ করেন। সে যুগে গোত্রীয় নেতা ও সামন্ত প্রভুদের স্বেচ্ছাচারিতা তাদের গোত্রের ছোট গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সারা দেশে সরকারী দল ও দলীয় প্রশাসন একচেটিয়া যুলুম চালিয়ে থাকে তথাকথিত ভোটের লাইসেন্স নিয়ে। ইসলামী বিধানে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এখানে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, আইনসভার সদস্য, আদালতের বিচারপতি সবাই আল্লাহর বিধানের দাসত্ব করতে বাধ্য। আল্লাহ বিরোধী কোন আইন মানতে কোন মানুষ বাধ্য থাকবে না। ফলে সরকারের যুলুম ও শোষণ থেকে এবং আদালতের অন্যায় বিচারের হাত থেকে মানুষ বেঁচে যাবে।

প্রকৃত অর্থে ইসলামী শাসনই হ'ল জনগণের শাসন। এর বিপরীত সবই হ'ল শয়তানী শাসন। যেখানে জনগণের কেবল শোষণ ও বঞ্চনাই লাভ হয়। যে উদ্দেশ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, তা থেকে তারা চিরবঞ্চিত থাকে। আধুনিক বিশ্বের অভিজ্ঞতাই তার বড় প্রমাণ। অতএব জনগণকে নিজেদের স্বার্থেই ইসলামী শাসন নিয়ে আসতে হবে। এজন্য তাদের সামনে মাত্র একটাই পথ খোলা রয়েছে। আর তা হ'ল নিজেদের মধ্যে ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ও তাঁর মাধ্যমে সামাজিক অনুশাসনে অভ্যস্ত হওয়া। অতঃপর এভাবে সাংগঠনিক ইমারতের মাধ্যমে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ইমারত কায়েম করা। এরূপ ইমারত একাধিক হ'লে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ইসলামী বিধি অনুযায়ী দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে সর্বসম্মত নেতা নির্বাচন করতে হবে। যাতে নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়ার সুযোগ না ঘটে। অতঃপর আমীর তার মনোনীত আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিসে শূরা গঠন করবেন। তাদের পরামর্শক্রমে এবং প্রয়োজনে অন্যদের পরামর্শ নিয়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজি ও স্বৈরাচারী শাসনে অতিষ্ঠ জনগণ অবশ্যই নিজেদের দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলামী খেলাফতের দিকে ফিরে আসবে। যেমন বিগত দিনে সিরিয়ায় খৃষ্টানরা মদীনা থেকে আগত মুসলিম বাহিনীকে স্বাগত

জানিয়েছিল এবং স্বধর্মীয় রোমক শাসনকে অগ্রাহ্য করেছিল। এ যুগে ইহূদী-খৃষ্টানদের চালান করা তন্ত্র-মন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আবারও ইসলামী শাসনকে স্বাগত জানাবে নিজেদের স্বার্থেই। আর তা অবশ্যই হবে কুরআন ও সুন্নাহর শাসন। ইসলামের নামে নিজেদের রচিত মাযহাবী শাসন নয়।

২. ইসলামী শরী'আত: সমাজ গঠিত ও পরিচালিত হবে ইসলামী শরী'আতের আলোকে, যার ভিত্তি হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর উপরে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতকে সেই নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, 'তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়ম-কানূন শিখে নাও। কেননা আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে মিলিত হ'তে পারব কি-না জানি না'। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা উক্ত দু'টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের আমীরের। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিতন্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই উত্তম ও সুন্দরতম সমাধান' (নিসা ৪/৫৯)। শরী'আত মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য প্রযোজ্য এবং তা সকলের জন্য কল্যাণকর। ইসলামী নেতা তার সমাজের অমুসলিম সদস্যের প্রতি ইসলামী বিধান অনুযায়ী আচরণ করবেন। নিঃসন্দেহে তাতে উক্ত ব্যক্তি অধিকতর উপকৃত হবেন। এরপরেও ধর্মীয় বিষয়ে তিনি স্বাধীন থাকবেন।

৩. শরী'আতের ব্যাখ্যা হবে সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী : সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষাগারের সরাসরি ছাত্র। কোন অবস্থায় কোন পরিস্থিতিতে তিনি কোন কথা বলেছেন ও কোন কাজ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরাই বড় সাক্ষী। অতএব কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যায় তাঁদের ব্যাখ্যাই সর্বাগ্রগণ্য। অতঃপর জ্যেষ্ঠ তাবেঈন ও মুহাদ্দেছীনের ব্যাখ্যা অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। উক্ত মূলনীতি অনুসরণে যেকোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সামাজিক ঐক্য ও

সংহতি এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি এর মাধ্যমেই নিশ্চিত হ'তে পারে। যতদিন মুসলিম উম্মাহ উক্ত নীতি মেনে চলেছে, ততদিন তারাই ছিল পৃথিবীর সেরা জাতি। কিন্তু পরে তারা উক্ত নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ায় অধঃপতিত হয়েছে। সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ্ব মানবতা। সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে গেলে ফেলে আসা নীতিতেই ফিরে যেতে হবে।

হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ 'সকল মুমিন একজন ব্যক্তির মত। যদি তার চোখে কষ্ট হয়, তাহ'লে সারা দেহে কষ্ট বোধ হয়। আর যদি মাথায় ব্যথা হয়, তাহ'লে সারা দেহ ব্যথাতুর হয়'।

একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى 'তুমি ঈমানদারগণকে পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়াশীলতার ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়'।

উপরোক্ত হাদীছগুলিতে উত্তম সমাজের চিত্র অংকিত হয়েছে। এখানে কেবল মুমিনদের কথা বলা হয়েছে। কেননা তারাই আল্লাহর নিকট 'শ্রেষ্ঠ জাতি' (আলে ইমরান ৩/১১০)। আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে একই লক্ষ্যের অনুসারী হওয়ায় মুমিন সমাজে এটা সহজেই সম্ভব। তবে কোন সমাজে কেবল মুমিন বাস করে না। বরং কাফির-মুশরিকরাও সেখানে বসবাস করে। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে মুমিনদের আচরণ কেমন হবে, সে বিষয়ে ইসলামের সুন্দর নির্দেশনা রয়েছে। যদি তারা মুমিনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা না করে, তাহ'লে তাদের প্রতি সর্বোচ্চ মানবিক আচরণ করা হবে। কারণ সবাই এক আদমের সন্তান। আদম ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। কিন্তু কাফের-মুশরিকরা তাদের আদি পিতা-মাতার ধর্ম ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। উত্তম উপদেশ ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখানো মুমিনের কর্তব্য। এর জন্য সে নেকী পাবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবে।

মানব সমাজ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একদল আল্লাহকে স্বীকার করে ও তাঁর বিধান মেনে চলে। আরেক দল নিজেদের সীমিত জ্ঞান তথা প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের পূজা করে ও যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলে। উভয় দল পৃথকভাবে বা একত্রিতভাবে সমাজে বসবাস করে। উভয় দলের মধ্যেই রয়েছে কট্টরপন্থী, মধ্যপন্থী ও শৈথিল্যবাদী। সবাইকে নিয়েই সমাজ। আর সমাজ নিয়েই মানুষ। প্রত্যেকে একে অপরের মুখাপেক্ষী। তাই সমাজ গঠনের ও তা পরিচালনার জন্য মানুষকে সর্বদা উচ্চতর জ্ঞানী ও শক্তিমানের অনুসারী হ'তে হয়। আর এটা আল্লাহরই চিরন্তন ব্যবস্থাপনা। যখন কোন সমাজ ও সমাজ নেতা আল্লাহর দাসত্ব করে ও তাঁর বিধান মতে চলে, তখন সেই সমাজ হয় উত্তম সমাজ। আর যখন তার বিপরীত হয়, তখন সেটি হয় নিকৃষ্ট ও শয়তানী সমাজ। তবে যেকোন সমাজে যেকোন সময় একই ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব ও শয়তানের দাসত্ব দু'টিই করতে পারে। সমাজের দায়িত্ব হবে তখন শয়তানী তৎপরতাকে রুখে দেওয়া ও মানবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। এভাবে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে উত্তম সমাজ গঠিত হবে। আর উত্তম সমাজ কাঠামোর মধ্যেই উত্তম ব্যক্তি ও পরিবার গড়ে ওঠা সহজ হয়। সমাজের বৃহত্তম রূপ হ'ল রাষ্ট্র। আর রাষ্ট্র সমূহের ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর রূপ হ'ল বিশ্বরাষ্ট্র। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বরাষ্ট্র সবই উত্তম হবে যদি উত্তম নীতিমালা ও উত্তম ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা তা পরিচালিত হয়। আর যদি অনুত্তম নীতিমালা ও অনুত্তম ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা তা পরিচালিত হয়, তবে সেই পরিবার ও সমাজ নষ্ট সমাজে পরিণত হবে। ঐ রাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্রে পর্যবসিত হবে। যেমন বর্তমান শতাব্দীতে অধিকাংশ রাষ্ট্র কার্যতঃ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

এখানে সমাজকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে একারণে যে, রাষ্ট্র বলি বা বিশ্বরাষ্ট্র বলি, সমাজই তার ভিত্তি। সমাজ যে আক্বীদা-বিশ্বাস ও রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হবে, রাষ্ট্র সেভাবে পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। কিন্তু এ রাষ্ট্র ইসলামী নীতিতে পরিচালিত হয় না। এর কারণ এখানকার মুসলিম সমাজের অধিকাংশ নেতা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। আবার আলেমগণ ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদত সমূহের মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে শত দলে বিভক্ত এবং অনেকে যিদ ও অহংকারে অন্ধ। সেই সাথে

সমাজও বিভক্ত। ইসলামের মূল তাওহীদী রূহ, যা পরস্পরকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখে, তা শিথিল হতে হতে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন মুসলমানেরা তাওহীদের উপরে কুফরীকে স্থান দিচ্ছে। ফলে এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে শয়তান। সে তার যাবতীয় উপায়-উপাদান নিয়ে জান্নাতের রাস্তায় প্রতিরোধ বসিয়েছে আছহাবুল উখদূদের কাহিনীতে রাস্তা বন্ধকারী বিশাল জন্তুটির ন্যায়। শান্তিপ্রিয় অধিকাংশ মানুষ চায় আল্লাহর উপর নিখাদ ভরসাকারী একদল তরুণ ও তাদের পরিচালনাকারী দৃঢ় ঈমানদার নেতা। আমরা একনিষ্ঠ হৃদয়ে চাইলে আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে তা দিবেন। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থেই আমাদেরকে উত্তম সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। আর তা অবশ্যই হ'তে হবে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধান অনুযায়ী।

তথ্যসূত্র: https//at-tareek.com

কুরআনিক সমাজের মানুষের বৈশিষ্ট্য:

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব: কুরআনিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে এই সমাজের লোকেরা সকল কাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু দাসত্ব করবে না। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নিশ্চিত করবে। আর এটাই হ'ল তাওহীদে ইবাদত। মানুষের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহ প্রেরিত বিধানের অধীনস্ত থাকবে। মানব রচিত আইন কোন অবস্থায় আল্লাহর আইনকে চ্যালেঞ্জ করবে না। করলে সেটা হবে শিরক। যার পাপ হবে অমার্জনীয়।

২. নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য: কুরআনিক সমাজের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আনুগত্যশীলতা। আনুগত্যহীন সংগঠন বা অবাধ্য সমাজ কখনোই উত্তম সমাজ হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ-

‘মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হ’ল পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সকল কর্মে আদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা। যতক্ষণ না কোন পাপকর্মে আদেশ করা হয়। যদি কোন পাপকর্মে আদেশ করা হয়, তাহলে কোন আনুগত্য নেই’।

তিনি বলেন, যদি কেউ তার আমীরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তাহলে সে যেন তাতে সবর করে। কেননা যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হ’ল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল’।

৩. পরামর্শ গ্রহণ: সমাজ পরিচালনায় যোগ্য ও উত্তম ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য। আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয়। সেখানে কোন পরামর্শ নেই। তবে তা বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রয়োজন। যেমন বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধসমূহ ছাড়াও দুনিয়াবী প্রায় সকল কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোগ্য ছাহাবীদের নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ‘তুমি প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি দৃঢ়কল্প হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি কেবল সংগঠন ও সমাজ পরিচালনায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং পরিবার পরিচালনায়ও যরূরী। একক পরিবার হৌক বা যৌথ পরিবার হৌক পরিবার প্রধানকে পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের সাথে পরামর্শ করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্তব্য। তাতে পরিবারের শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হবে। যদি নেকীর কাজে সিদ্ধান্ত হয়, তবে ঐ পরিবারে আল্লাহর পক্ষ হ’তে বিশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হবে। একইভাবে উক্ত সমাজের উপরেও আল্লাহর রহমত নাযিল হবে, যেখানে সর্বদা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. দায়িত্বশীলতা: কুরআনিক সমাজের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা। এই সমাজের প্রত্যেক সদস্য পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করবে। তারা কেউ কাউকে অসম্মান করবে না, যুলুম করবে না, লজ্জিত করবে না।

এই সমাজের প্রত্যেকের জন্য পরস্পরের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান নিষিদ্ধ। এ সমাজে কেউ অসুস্থ বা পীড়িত হ'লে অন্যের দায়িত্ব পড়ে যায় তাকে সুস্থ করার ও চিকিৎসা করার। প্রাথমিক দায়িত্ব নিজ পরিবারের হ'লেও মূলতঃ এ দায়িত্ব সমাজের। এমনকি একটা পশু বিপদে পড়লেও এ সমাজের মানুষের কর্তব্য হ'ল তাকে উদ্ধার করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিগত যুগে একজন বেশ্যা মহিলা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরকে দেখতে পায়। তখন সে গভীর কূয়ায় নেমে নিজ চামড়ার মোযায় পানি ভরে এনে তাকে খাওয়ায়। তাতে প্রচন্ড দাবদাহে মৃত্যুর কোলে পৌঁছে যাওয়া কুকুরটি বেঁচে যায়। এতে খুশী হয়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন ও সে জান্নাতবাসী হয়'। এর বিপরীতে আরেকজন মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে না খেতে দিয়ে কষ্ট দিলে সে মারা যায়। এর ফলে ঐ মহিলা জাহান্নামী হয়। উত্তম সমাজে পশুর যখন এত সম্মান ও জবাবদিহিতা, সে সমাজে শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষের কেমন মর্যাদা হওয়া উচিত, তা অবশ্যই অনুধাবনযোগ্য। আল্লাহ বলেন, 'আমরা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি। তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' (ইসরা ১৭/৭০)।

বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বড়দের মর্যাদা বুঝে না ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না, সে মুসলমানের দলভুক্ত নয়'। বলা হয়েছে, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী আললাহ তোমাদের উপর রহম করবেন'। বলা হয়েছে, 'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।

এভাবে উত্তম সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্বশীল হবে এবং একে অপরের জান-মাল ও ইয্যত রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। এর বিনিময় সে আল্লাহর কাছে কামনা করবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা কিছু সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা তোমরা আল্লাহর নিকট পেয়ে যাবে। আর সেটাই হ'ল উত্তম ও মহান পুরস্কার' (মুযযাম্মিল ৭৩/২১)।

৫. উত্তম চরিত্র: কুরআনিক সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এ সমাজের সদস্যরা হবেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাদের কাছে পরস্পরের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তারা একে অপরের নিকট বিশ্বস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সর্বাধিক ভারী হবে তার উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন অশ্লীলভাষী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির প্রতি'। ব্যক্তি জীবনে তারা চরিত্রবান, ধৈর্যশীল, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী হবে। পারিবারিক জীবনে সে পিতা-মাতার প্রতি অনুগত হবে। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি সদাচরণ করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যব্যবহার করবে। পুরুষ ও নারী পরস্পরে দৃষ্টি অবনত রাখবে। যথাযথ পর্দা রক্ষা করে চলবে। মায়ের জাতিকে সর্বোচ্চ সম্মান দিবে। সকল কাজে লজ্জাশীলতা বজায় রাখবে। সামাজিক জীবনে সে পরস্পরকে সালাম করবে, হাসিমুখে কথা বলবে, ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষা করবে। পারস্পরিক লেনদেনে বিশ্বস্ত থাকবে। ঝগড়ার বিষয়ে আপোষকামী থাকবে। হক্কুল্লাহ আদায়ের ব্যাপারে সদা যত্নশীল থাকবে। ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, সাদাকা ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। তার প্রতি সর্বদা ভরসাকারী থাকবে এবং যে কাজ করলে তিনি খুশী হন, সর্বদা সে কাজে অগ্রণী থাকবে। সামাজিক বা রাজনৈতিক দায়িত্ব পেলে সর্বদা অধীনস্তদের প্রতি দয়াশীল থাকবে।

তথ্যসূত্র: https//at-tareek.com

০৯.কুরআনের আলোকে রাষ্ট্র সমাজ গঠনে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষদের ভূমিকা:

মুসলমানদের মধ্যে কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিশন থাকতে হবে। রাসূলে কারিম (সা)-এর সামনে ভিশন ছিল দ্বীনকে গালিব করা। সাহাবায়ে কেরাম সেই ভিশনকে সামনে রেখে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন। এ জন্য শত নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করেছিলেন। আপন জন্মভূমি থেকে হিজরত করেছিলেন। ভিশনের জন্য তাঁদের ত্যাগ ও কোরবানির বিনিময়ে মাত্র তেরো বছরের ব্যবধানে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা সক্ষম হন। আর আট বছরের ব্যবধানে যে মক্কা থেকে তাঁরা হিজরত করেছিলেন সেই মক্কা জয় করে ইতিহাস স্থাপন করেছিলেন। আজকের যুগেও মুষ্টিমেয় কিছু ইহুদির স্বপ্ন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে অবিরাম চেষ্টা সাধনার কারণেই 'ইসরাইল'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। সারা বিশ্ব থেকে ইহুদিরা সেখানে জড়ো হয়ে ফিলিস্তিনিদেরকে উচ্ছেদ শুরু করে। তারা সংখ্যায় কম হলেও ইউরোপ আমেরিকার রাজনীতি তাদের নিয়ন্ত্রণে। কেননা রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে ধরনের জ্ঞান যোগ্যতা ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকা দরকার তার সবই মুষ্টিমেয় ইহুদিদের হাতে রয়েছে। ইহুদিরা অনেক বড় পজিশন ছেড়ে দিয়ে ছোটোখাট চাকরি নিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাড়ি জমাচ্ছে তাদের মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য। আফসোসের বিষয় হচ্ছে আজকের মুসলমানদের অধিকাংশের সামনে কোন ভিশন নেই। মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটি অংশের সামনে ভিশন থাকলেও ভিশনকে সামনে রেখে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

কুরআন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ নেয়ামত এ কথা মুসলমানদের আলাপ আলোচনা কথাবার্তা, উঠা-বসা, বিবাহ-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি-অর্থনীতি সব কিছুর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতে হবে। কুরআন এসেছে মানুষের জীবনের পরিবর্তন সাধনের জন্য। মুসলমানরা যদি তাদের আচরণ দিয়ে অমুসলিমদের সামনে এ কথা প্রমাণ করতে পারে যে কুরআনের বিধানের মধ্যেই সকল মানুষের কল্যাণ নিহিত। তাহলে অমুসলিমরা কুরআনের দিকে ঝুঁকবে। আফসোসের বিষয় হচ্ছে অনেক অমুসলিম যখন কুরআন পড়া শুরু করে তখন কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয় আবার যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় তখন হতাশ হয়। এ প্রসঙ্গে একজন

ইংরেজের কথা উল্লেখ করতে চাই। তিনি কুরআন পড়তে গিয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে দুঃখ করে বলেন, কুরআন পড়লে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা জাগে। কিন্তু মুসলমানদের চরিত্র দেখলে সে ইচ্ছা দূর হয়ে যায়। আরেকজন ইংরেজ কুরআন পড়া শুরু করার পর কুরআনের অমিয়বাণী তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করতে লাগলো। তারপর তিনি মুসলমানদের কাছে জানতে চান তোমরা যে কুরআন মেনে চলো সে কুরআন আমাকে একটু দেখাও। মুসলমানদের কাছ থেকে জবাব এলো তোমার কাছে যে কুরআন আছে সেই কুরআনই আমরা মেনে চলি। আমাদের কুরআন একটিই। তখন তিনি বললেন, না আমার কাছে যে কুরআন আছে সে কুরআনে যা লেখা আছে তার সাথে তোমাদের চরিত্রের কোনো মিল নেই। তাই আমার কাছে মনে হয়েছে তোমাদের কুরআন দু'টি। একটি পড়ার জন্য আর আরেকটি আমল করার জন্য।

আমরা যদি কুরআনের বিজয় চাই তাহলে আমাদেরকে কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে বোঝার জন্য। বুঝতে হবে আমল করার জন্য। আর শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগির বিধান আমল করলেই চলবে না বরং সামাজিক বিধিবিধান আমল করার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। যে সমাজে কুরআনের বিধিবিধান কায়েম নেই সে সমাজে কুরআনের বিধিবিধান কায়েমের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং কুরআনি সমাজ কায়েম করার স্বপ্ন নিয়ে মানুষদেরকে কুরআনের পথে আসার উদাত্ত আহবান জানাতে হবে।

কুরআনের যে সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই সে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তা তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ মানুষকে বোঝাতে হবে কুরআনি সমাজ কায়েম হওয়ার অর্থ হচ্ছে কোন মানুষ কোন মানুষের দাসত্ব করতে হবে না। সকল মানুষ মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। সাদা-কালো আরব-আজমের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার কোন পার্থক্য হবে না। সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড হবে তাকওয়া। তাই কুরআনি সমাজে ভাষার ও বর্ণের বড়ত্ব কিংবা লড়াই নেই।

আমরা যে সমাজে বসবাস করছি এ সমাজকে জাহেলি সমাজ বা গায়রে ইসলামী সমাজ যে নামেই অভিহিত করি না কেন এ সমাজের শাখা-প্রশাখা অনেক গভীরে গ্রথিত। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, কলা সকল ক্ষেত্রেই জাহেলি দর্শন কাজ করছে। তাই কুরআনি সমাজ মানে এসব ক্ষেত্রে প্রলেপ দেয়া নয় কিংবা এসকল কিছুর আংশিক রদবদল নয় বরং ব্যাপক ও সার্বিক পরিবর্তনই প্রয়োজন। এ পরিবর্তন আনয়নের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন একদল বাহিনী কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি। এ জরুরত ঐচ্ছিক নয় বরং আবশ্যিক। এ আবশ্যিক জরুরত পূরণে যত বিলম্ব হবে ইসলামী সমাজ তথা কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠায় তত বিলম্ব হবে। বর্তমান সভ্যতা পরিবর্তন করে নতুন সভ্যতা গড়বার মতো যোগ্যতা যদি মুসলমানদের না থাকে তাহলে আল্লাহ মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবেন না।

কুরআনি সমাজ কায়েম করার জন্য এর স্বপক্ষে জনমত সংঘটিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বর্তমান সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলো জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। কুরআনি সমাজব্যবস্থায় তার উত্তম বিকল্প কী হবে তাও জনতার সামনে হাজির করা। এ কথা পরিষ্কার করতে হবে যে কুরআনি সমাজে দেশের আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়ার অর্থ এ নয় যে কাঠামোগত সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। বর্তমান সমাজ কাঠামোর এমন অনেক দিক আছে যা কুরআনি সমাজেও অব্যাহত থাকতে পারে। কুরআনি সমাজে সব কিছুর দার্শনিক ও আদর্শিক পরিবর্তন সাধিত হবে। কাঠামোগত পরিবর্তন জনগণের সুবিধার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের সুখ শান্তি নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান কাঠামোর যে দিকটি পরিবর্তন করা দরকার হবে শুধু সেই দিকটিই পরিবর্তন হবে।

আজকের বিশ্ব যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা শক্তির জোরে শাসন করলেও তাদের মধ্যে শক্তি প্রদর্শনের বৈষয়িক যোগ্যতা আছে। আমরা যারা কুরআনি সমাজ কায়েম করতে চাই তাদের মধ্যে তাদের শক্তির মোকাবেলা করার হিম্মতের যেমনি অভাব আছে তেমনি সেই হিম্মত প্রদর্শনের বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্যরেও ঘাটতি রয়েছে। ওরা যখন

অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে সেই ভাষার জবাব বক্তৃতা বিবৃতি হতে পারে না। অস্ত্রের ভাষার জবাব অস্ত্র দিয়েই দিতে হবে। অস্ত্রের পরিমাণ ও সংখ্যার মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে। কিন্তু অস্ত্রের মানের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকলে চলবে না। পারমাণবিক অস্ত্রের মোকাবেলায় পারমাণবিক অস্ত্র থাকা চাই। লাঠি ও বল্লম দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রের মোকাবেলা হতে পারে না। হ্যাঁ আল্লাহর সেই কুদরত আছে তিনি গায়েবি মদদ দিয়ে অস্ত্র ছাড়াও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করতে পারেন। আবার প্রচুর অস্ত্র থাকলেও আল্লাহর রহমত না হলে পরাজিত হতে পারে। আল্লাহর রহমতই মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার মৌলিক কারণ হলেও আল্লাহ তাঁর সুন্নাতের বাইরে শিক্ষণীয় কতিপয় দৃষ্টান্ত ছাড়া কাউকে সাহায্য করেন না। যদি সাহায্য করতেন তাহলে তাঁর রাসূলকে তায়েফে, উহুদে কাফেরদের বাধার মোকাবেলায় রক্ত দিতে হতো না। আল্লাহর রাসূল বদরের যুদ্ধে তৎকালীন সময়ের আলোকে শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সমর প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। হতে পারে সংখ্যার দিক থেকে এ প্রস্তুতি কাফেরদের তুলনায় কম ছিল কিন্তু মুসলমানদের ঈমানী শক্তির কারণে সে কমতি গায়েবি মদদে পুষিয়ে দেয়া হয়। আজকের যুগেও ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ মদদ করতে সক্ষম। প্রয়োজন হচ্ছে সত্যিকার ঈমান ও কুরআনবিরোধীদের বাধা মোকাবেলা করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ ও প্রস্তুতি।

কুরআনি সমাজ কায়েম করার কথা আল কুরআনের যত জায়গায় এসেছে সকল জায়গায় জান ও মালের কথা সমানভাবে বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু সময় শ্রম দিলে হবে না। এর জন্য অর্থও দিতে হবে। কাফেররা দুনিয়াতে ধন-দৌলতের পেছনে দৌড়ায় এ ক্ষেত্রে বৈধ বা অবৈধ কোন সীমারেখায় তারা বিশ্বাসী নয়। মুসলমানরা ধনের পূজারি হবে না তবে বৈধ পন্থায় ধন উপার্জন করার চেষ্টা করতে হবে। ইসলাম হালাল পন্থায় উপার্জনকে উৎসাহিত করেছে। এ কারণে একজন সৎ ব্যবসায়ীকে আল্লাহর হাবিবের বন্ধু বলা হয়েছে। কারণ হচ্ছে কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এমন অনেক প্রজেক্ট হাতে নিতে হয় যেসব প্রজেক্ট বাস্তবায়নে প্রচুর টাকার দরকার হয়। গণভিত্তি রচনা করতে হলে গণমুখী কর্মসূচি নিতে হবে। শুধু রাজনৈতিক গণমুখী কর্মসূচি নিলে চলবে না মানুষের সেবামূলক

কর্মসূচিও নিতে হবে। এ জন্য কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠাকামীদের বৈধ পন্থায় উপার্জন ও উপার্জনের একটি অংশ দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রজেক্টে খরচ করতে হবে। আমার জানামতে ইহুদি অনেক কোম্পানি আছে যারা প্রতি সপ্তাহে একদিনের লাভ ইসরাইলের জন্য ব্যয় করেন। তার বিপরীতে মুসলমানরা তাদের সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করার পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করছে বা অপচয় করছে। মুসলমানরা সামষ্টিকভাবে কিছু করুক বা না করুক কিছু ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে সমাজে কিছু করার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখা যাবে একদিন ক্ষুদ্র ব্যক্তি চেষ্টা মহীরুহে পরিণত হয়ে সমাজে বিরাট প্রভাব ফেলবে।

তথ্যসূত্র: https//sonalunews.com

১০. কুরআনের আদলে জীবনব্যবস্থা পরিচালনায় যথাযথ ব্যবস্থা সমূহ

১.ব্যক্তি জীবনে: ব্যক্তি থেকে শুরু হয় পরিবার, তারপর সমাজ। ব্যক্তি জীবন যদি সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শবান হয় তাহলে সুস্থ-সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে উঠে। আল-কুরআনে ব্যক্তি জীবনের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। মানুষের অকীদা-বিশ্বাস লক্ষ্য নির্ধারণের নির্ভর করে তার জীবনের সুখ-শান্তি, উন্নতি এবং মুক্তি। আল-কুরআন মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, শিরক, বিদ‘আত, কুফরি, মুনাফেকি, হিংসা-বিদ্বেষ, চোগলখুরি, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মিথ্যা, অশ্লীলতা, খুনখারাবি প্রভৃতি অপকর্ম থেকে মুক্ত থেকে ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর ও আদর্শবান করার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰىهَا ٧

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰىهَا ٨

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكّٰىهَا ٩

وَقَدْ خَابَ مَن دَسّٰىهَا ١٠

“মানুষের নফসের ও সেই সত্তার শপথ, যিনি তা সুঠাম করেছেন। পরে তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পবিত্র করে সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে সেই ব্যর্থ হয়”। (সূরা শামস ৯১:৭-১০)

২. পারিবারিক জীবনে: পরিবার হলো সামাজিক জীবনের ভিত্তি। ইসলাম পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। পারিবারিক জীবনব্যবস্থাকে সুন্দর ও সুদৃঢ় করার জন্য আল-কুরআনে বহু বিধান রয়েছে। মানব বংশ বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তা‘আলা আলকুরআনের মাধ্যমে পবিত্র ও কলুষমুক্ত দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য বৈবাহিক ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। অন্যায় ও হারাম পথে চলা এবং অসামাজিক কাজকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ইসলাম বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব-মানবির চরিত্র পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করেছে। মানব মর্যাদা ও মানব বংশধারার পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

“তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতিদের মধ্যে থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ

করতে পারে এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন” (সূরা রূম-৩০:২১)

৩. সামাজিক জীবনে: সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সামাজিক জীবন যাপন নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় আনচার অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদসহ সব ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজের সকল মানুষের সাথে সৎভাব বজায় রাখার জন্য আত্মীয় স্বজন ও

প্রতিবেশির অধিকার নিশ্চিত করেছে আল-কুরআন। আল-কুরআনে উপস্থাপিত সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ জীবনে কোন সমস্যাই থাকবে না।

৪.রাষ্ট্রীয় জীবনে: সমাজের বৃহত্তর সংগঠন হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় জীবনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সরকার ও প্রজা সাধারণের মাঝে সুমধুর সম্পর্ক, আইন শৃংখলার

বিধান এবং পারস্পরিক সংহতির উপর। আল-কুরআন সরকার ও সরকার প্রধানকে জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য শূরা ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের নির্দেশনা দান করেছে।আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"এবং কাজে-কর্মে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯)

আল্লাহ তা'আলা হলেন উত্তম বিধানদাতা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষের নিজের আইন তৈরি করার অধিকার নেই। মানুষের কাজ হলো আল্লাহ তা'আলার দেওয়া প্রত্যেকটি বিধান পালন করা। আল্লাহর বিধানের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সেই বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হলে মানুষ সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

৫.আন্তর্জাতিক জীবনে: বিশ্ব মানব সমাজের বৃহত্তর অঙ্গন হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। মানুষের আন্তর্জাতিক জীবনের সুখ-শান্তি বির্ভর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর। কেননা পৃথিবীতে রয়েছে রকমারি, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা সভ্যতা ও জাতীয়তা। তাই ইসলাম পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও মানব প্রেমের

নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। সকল জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানই হচ্ছে ইসলামের মূলকথা।সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও আদম সন্তান। অতএব বিশ্বের সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করাই ইসলামের নীতি। বিনা অপরাধে দুনিয়ার যে কোন মানুষকে শাস্তি বা কষ্ট দেওয়া মহাপাপ। আর সে যে কোন ধর্ম, বর্ণ গোত্র, ভাষা ও জাতির হোক না কেন। ইসলামি অন্তর্জাতিকতাবাদের মূলীতি হলো- সন্ধি ও সহাবস্থান, আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দান, অন্য জাতির সাথে বন্ধুসূলভ আচরণ, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মজলুম মুসলমানকে সাহায্য করা।

৬. রাজনৈতিক জীবনে: মানুষ আজ ইসলামের ছায়াতল থেকে দূরে সরে যাওয়ায় নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। মানুষ এ সকল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ন করছে। কুরআন-হাদিসের শিক্ষা ও মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে অসৎ লোকেরা দেশ শাসন করছে। ফলে সমস্যা আরো জটিল হতে জটিলতর হচ্ছে। কারণ মানুষের সসীম জ্ঞান দিয়ে কখনো সকলের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে না। তাই রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআনের বিধানই হতে হবে সকল কর্মকাণ্ডের মূল উৎস। যদি তা না করা হয় তবে রাজনৈতিক জীবন কলুষিত, সীমাহীন দুর্নীতি ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার হবে।

৭. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে: মানুষ কেবল দেহ সর্বস্ব জীব নয়। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাবলির সঠিক ও নির্ভুল সমাধান রয়েছে আল-কুরআনে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে,

, "হে মানবজাতি!তোমাদের নিকট তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত এসেছে। (সূরা ইউনুস-১০ : ৫৭)

৮. অর্থনৈতিক জীবনে: আল-কুরআনে অর্থনৈতিক বহু বিষয়ের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সমাধান রয়েছে। আল-কুরআন অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার যে নীতিমালা পেশ করেছে তা অনুসরণ করলে সমাজের মধ্যে ধনী-গরীবের ব্যবধান কমে আসবে। ইসলাম সুদ প্রথার বিলোপ সাধন করে যাকাত ব্যবস্থা চালু করেছে। অবৈধ উপার্জনকে ইসলাম চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে। গরীব-মিসকীন,অনাথ ও অসহায়দের জন্য বিভিন্ন প্রকারের দান ও সাদাকার বিধান দিয়েছে। ইসলাম চায় না যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে থাকুক। ইসলাম সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে যে চিরস্থায়ী ও উদারনীতি ঘোষণা করেছে তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ এই পৃথিবীতে শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলতে পারবে।

তথ্যসূত্র: https// qualitycando.com

১১. সিদ্ধান্ত

আল-কুরআন মানুষের সকল সমস্যার মোকাবেলা করে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলোর পথে এনেছে। কেননা, আল-কুরআনে রয়েছে সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান। কুরআন মাজিদ বিশ্বমানবের সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবননির্বাহের আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থাপনা। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক জীবন অবধি, জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ও বিভাগে মানব সমস্যার অন্ত নেই। অবশ্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি মানবজাতিকে সমস্যার মধ্যে অসহায়ভাবে ফেলে রাখেননি। মানবজাতিকে এ সমস্যার আবর্ত হতে পরিত্রাণ করে সুষ্ঠ-শান্তিময় ও উদ্বেগহীন জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অগণিত নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং জীবন সমস্যার সমাধান হিসেবে তাদেরকে দান করেছেন আসমানি কিতাব। এ ধারায় সর্বশেষ নবি ও বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব আল-কুরআন নাজিল করেছেন। তিনি মানবজীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান এই মহাগ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর আমি তোমার ওপর কিতাব নাজিল করেছি, যা প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত, হেদায়েত, রহমত এবং সুসংবাদ-মুসলিম জাতির জন্য (সুরা নাহল: ৮১)

রাসুলুল্লাহ (স) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে এজন্যই বলেছেন আমি তোমাদের মাঝে দুটো বিষয় রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে ধর, কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি তাঁর রাসুলের সুন্নত' (মিশকাত)।

তাই সুষ্ঠু সুন্দর পরিবার,সমাজ,রাষ্ট্র বিনির্মানে কুরআনের ভূমিকা অপরিসীম। পাঠ্যপুস্তক আমাদের কিছু বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারে। পক্ষান্তরে কুরআনুল কারিম জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্যাকেজ যাতে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে উত্তরণের পথ বাতলে দেওয়া আছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রাষ্ট্র সমাজ পরিবর্তনে পাঠ্যপুস্তকের তুলনায় কুরআনের ভূমিকা অনেক গুন বেশি।

১২. রেফারেন্স

- https//at-tareek.com
- https//dr-mobarakhossain.com
- https//qualitycando.com
- https//sonalinews.com
- https//rocketsuggestionbd.com
- https//lekhabl.com
- https//somajbiggan.com
- https//somewhereinblog.net

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111407346/